হেনরিক ইবসেন

নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের জন্ম ১৮২৮ সালে নরওয়েতে। *ব্যান্ড* এবং *গিয়ার জিন্ট* নাটকের মাধ্যমে প্রথমে স্বদেশে খ্যাতি অর্জন করেন ইবসেন। ১৮৮০ দশকে ইউরোপের অন্যান্য দেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। শতবর্ষ পরেও ইবসেনের নাটক ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া আফ্রিকার নানা দেশে অভিনীত হচ্ছে। আধুনিক যুগের নৈতিকতার সংকট, বিশেষ করে নারীর সামাজিক অবস্থান তাঁর নাটকের প্রধান উপজীব্য।

তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে *ডলস হাউস, হেড্ডা গ্রাবলার, দি মাস্টার বিল্ডার, ঘোস্ট ইত্যাদি।*

ইবসেন ১৯০৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

হেনরিক ইবসেনের এই সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছিল ১৮৯৭ সালে। মনে রাখা ভালো আলাপের প্রেক্ষাপট একশো বছরের আগের ইউরোপ। সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন আর এইচ শেরার্ড *দি হিউম্যানিটোরিয়ান* পত্রিকার পক্ষ থেকে। এই সাক্ষাৎকারে ইবসেনের ব্যক্তিজীবনের কিছু দুর্লভ মুহূর্ত যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি প্রকাশিত হয়েছে নাটক বিষয়ে ইবসেনের নিজস্ব কিছু ভাবনা। সাক্ষাৎকারটির সংকলিত হয়েছে ক্রিস্টোফার সিলভেস্টার সম্পাদিত *দি পেঙ্গুইন বুক অব ইন্টারভিউজ* গ্রন্থে। আমার ভাষান্তরিত সাক্ষাৎকারটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ২২ নভেম্বর ১৯৯৬ এর *ভোরের কাগজ*-এর সাহিত্য সাময়িকীতে।

একাকী, বিষণ্ণ

হেনরিক ইবসেনকে গত ছয় সপ্তাহ ধরে আমি প্রায় প্রতিদিনই দেখছি। যে হোটেলটাতে উঠেছি, প্রতিদিন সেখানে তিনি দুবার করে আসেন। একাই আসেন প্রতিবার। কোনোদিন তাঁর সঙ্গে কোনো সঙ্গী দেখিনি। প্রতিদিন নির্দিষ্ট দুটো সময়ে গ্র্যান্ড হোটেলের ভেতরের দিকের একটি ঘরে এক গ্লাস পানীয় নিয়ে তিনি বসেন এবং নরওয়েজিয়ান পত্রিকাগুলো উল্টেপাল্টে দেখেন। শুধু বাইরে কেন, ভিক্টোরিয়া টেরেসে তাঁর নিজের বাড়িটিতেও তিনি এমনি একজন একাকী মানুষ। সাংসারিক জীবনে অনীহা তাঁর। কীর্তিমান একমাত্র ছেলে ডা: সাইগার্ড ইবসেনের বাড়িতেও তিনি কখনো যান না, এমনকি ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানেও তিনি যাননি।

তাঁর এই বিষণ্ণতা, এই অসামাজিকতার ব্যাপারটা আমাদের কাছে বেশ অস্বাভাবিক ঠেকে। নরওয়েজিয়ানদের সাধারণভাবে আমুদে আড্ডাপ্রিয় বলেই জানি। এ বিষয়ে আর এক নরওয়েজিয়ান লেখককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বেশ খেপে গিয়ে বলে উঠলেন 'আরে ইবসেন তো নরওয়েজিয়ান নয় মোটেও। তাঁর জন্ম স্কচ পরিবারে। জীবন আর মানুষ নিয়ে তাঁর ঐসব বিষণ্ণতা আসলে ঐ কারণেই। একজন বিদেশি এসে এই ক্রিশ্চিয়ান শহরে হতাশার ব্যবসা করছে, অথচ নরওয়েজিয়ানরা চুপচাপ রয়েছে এটা মোটেও ঠিক নয়।

যাহোক, আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, ইবসেনের হতাশা সম্পূর্ণ আন্তরিক। তিনি বস্তুত

একজন অসুখী মানুষ। তাঁর সঙ্গে অনেকবার আলাপ হয়েছে আমার কিন্তু তাঁকে হাসতে দেখেছি শুধু একবার। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—প্যারিসের ফিগরো পত্রিকায় 'আধুনিক চিত্রকলায় ইবসেনের প্রভাব' নামের নিবন্ধটি তিনি পড়েছেন কি না। তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'সাংবাদিকরা কত কী যে আবিষ্কার করতে পারে?' আলাপ করতে বসলে অধিকাংশ সময়ই তিনি নীরব থাকেন। তাছাড়া কোনো ধরনের সাক্ষাৎকার দেয়ার ব্যাপারে তাঁর রয়েছে ভীষণ অনীহা। তাঁর সঙ্গে যেদিন আমার প্রথম দেখা, সেদিন বার্লিনের একটি পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে সাক্ষাৎকার আকারে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটি পড়ে তিনি খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি সেসময় যে নাটকটি লিখছিলেন, বিভিন্ন পত্রিকায় সে সম্পর্কে নানারকম লেখা হচ্ছিল। ইবসেন আমাকে বলেছিলেন 'এগুলো কোনোটিই সঠিক নয়। এক জার্মান পত্রিকা এমনকি এও লিখেছে যে, ইবসেনের আগামী নাটকের নাম নাকি 'দি স্মেল অব ক্রুপস।' ইবসেন বলছিলেন, 'আমি আমার নতুন নাটক সম্পর্কে কখনোই কারোর সঙ্গে কথা বলি না। প্রকাশিত হওয়ার আগে নাটকের সামান্য কোনো তথ্য কারো জানার কথা নয়।' এ ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে সতর্ক হয়েছেন, একবার এক অতি উৎসাহী আমেরিকান প্রকাশক কোপেনহেগেনের প্রেস থেকে কম্পোজিটরকে ঘুষ দিয়ে ইবসেনের একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে যায় এবং আগাম প্রকাশ করে ফেলে। এ ছাড়াও সত্যি কথা বলতে, তাঁর কোনো অনুরাগী পাঠকের সঙ্গে আলাপ করতেও তিনি বিশেষ আগ্রহী নন। তাঁর স্বভাব, জীবনযাপন ইত্যাদি দেখে তাঁকে রীতিমতো মানববিদ্বেষী বলেই মনে হয়। যদিও সম্প্রতি তিনি জীবনে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছেন, তবু বলতে হয়, এ সাফল্য এল খুবই দেরিতে। প্রায় মধ্যবয়স পর্যন্ত এদেশে তাঁর সাহিত্যকর্মকে কোনো গুরুত্বই দেওয়া হতো না, তাঁর নাটকগুলোকে উপহাস করা হতো। নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন তিনি। খুব বেশিদিনের কথা নয়, যখন ভাগ্যান্বেষণে নরওয়ে ত্যাগ করার আগে এক প্রকাশকের কাছে মাত্র ১২ পাউণ্ডে তিনি তাঁর নাটকের স্বত্ব বিক্রি করেছেন। সংসার ও নারীসংক্রান্ত অভিজ্ঞতাও তাঁর সুখের নয়। 'মাস্টার বিল্ডার' নাটকে তিনি তাঁর যুবক বয়সের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়েছিলেন অথচ সেসব আকাঙ্ক্ষার কত সামান্যই তাঁর জীবনে বাস্তবায়িত হলো। নরওয়ের প্রেক্ষাপটে আজ ইবসেন নিঃসন্দেহে বিখ্যাত, অর্থশালী মানুষ, কিন্তু দুর্ভাগ্য এই অর্থ তাঁর হাতে এল অসময়ে। তাঁর আজকের এই সুদিন তাঁর যুবক আর মধ্যবয়সের সেইসব বঞ্চনার দিনগুলোকে কি আর পুষিয়ে দিতে পারবে? একমাত্র লেখা আর অবিরাম পঠন-পাঠন ছাড়া তাঁর জীবনে আর কোনো আনন্দ নেই। জার্মান দর্শনের একনিষ্ঠ পাঠক তিনি। একদিন কান্ট সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তাঁর লেখা আমি পড়ি প্রথমত দায়িত্ব হিসেবে। দ্বিতীয়ত, আনন্দের জন্য।'

দিনে দুবার ঘণ্টাখানেকের জন্য এই গ্র্যান্ড হোটেলে এসে বসাই তাঁর একমাত্র বিশ্রাম। এখানে বসে তিনি দিনের পত্রিকাগুলো পড়েন। পালা করে একবার ডান দিকে রাখা বিয়ারের গ্লাসে, একবার বাঁ দিকে রাখা পানির গ্লাসে চুমুক দেন। প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে তিনি শহরের রাস্তায় হাঁটেন। তাঁর পরনে থাকে কালো আনুষ্ঠানিক ধরনের কোট আর মাথার কালো টুপিটা

খানিকটা হেলানো থাকে পেছনে। দিনের বাকিটা সময় তিনি নিভৃতেই কাটিয়ে দেন তাঁর গ্র্যান্ড টেরেসের বাড়িতে। সে বাড়িতে কদাচিৎ কোনো দর্শনার্থীকে ঢুকতে দেওয়া হয়। তাঁকে শহরের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখা যায় না। কারো সঙ্গে বসে গল্প করছেন এরকম অবস্থাতেও তাঁকে দেখা দুষ্কর। বিষাদচ্ছন্ন একটি জীবন কাটান তিনি সর্বদা।

নীতিহীন ক্রিশ্চিয়ানা

আমার মনে আছে, ক্রিশ্চিয়ানায় আসার একমাস পর একদিন আমাকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখনো এখানে কী করছেন? এ শহরে এতদিন ধরে কী করার আছে?'

আমি বলি, 'আমার কাছে সবকিছুই বেশ নতুন লাগছে। পর্যবেক্ষণের জন্য ক্রিশ্চিয়ানা বেশ মজার শহর।'

'তা অবশ্য ঠিক'—ইবসেন বললেন, 'ক্রিশ্চিয়ানা নিঃসন্দেহে ইউরোপের সবচেয়ে নীতিহীন শহর। সমাজকে পাঠ করতে চাইলে এর মতো মোক্ষম শহর আর ইউরোপে দ্বিতীয়টি নেই। যেমন ধরুন, বিবাহ এ শহরে নেই বললেই চলে। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে প্রথমত, বেশ্যাবৃত্তির ওপর সরকারি খবরদারি তুলে দেওয়া, যার ফলে আমাদের যুবকদের এখন খুঁজে পাবেন প্রতিবেশীদের কোনো চোরাগোপ্তা ঘরে : আর দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিক বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের অনুমোদন।'

'কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রক্রিয়াটি কি এখনো ততটা সহজ হয়েছে? আমি জানতে চাই।

'হ্যাঁ, ছেলেমেয়ে যে-কেউ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করলেই হলো, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যায়। যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ব্যাপারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তাদের বিচ্ছেদ ঘটানোর ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেট কোনো কার্পণ্য করেন না। লোকের চোখে এখন বিয়ের বিভীষিকা কমে এসেছে। জার্মান, ফ্রান্সের মতো এখানে ইউনিয়ন লিডার আর দরকার নেই।'

'আপনি কি মুক্ত মেলামেশার পক্ষে?'

'আমি কোনোকিছুরই পক্ষে নই। আমার নাটক কোনো নীতিকথা প্রচার করে না। আমি জীবনকে যেভাবে দেখি সেভাবেই বর্ণনা করি মাত্র।'

'নরওয়ের জীবন?' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'নিশ্চয়ই। আমি একজন নরওয়েজিয়ান নাট্যকার, আমি নরওয়ের জীবনই বর্ণনা করি। দেশ কী করে আরো ভালোভাবে চলবে, আমার নাটক তার উপায় বাৎলে দেয় না। আমি শিক্ষক নই। আমি মানুষের ছবি আঁকি মাত্র।'

'কিন্তু মানুষের ছবিও তো মানুষকে অনেক সময় শিক্ষা দেয়।'

ইবসেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেন, 'মাস্টারি করা আমার কাজ নয়।'

'নারী' প্রশ্ন

এর কিছুদিন পর আবার একদিন তাঁকে আলাপি মেজাজে পাই, সেদিন জিজ্ঞাসা করি, 'আপনার কি মনে হয়, আগামীতে মূল সামাজিক প্রশ্ন হবে 'নারী' প্রশ্ন?'

তিনি হেসে বললেন, 'আগামীতে কেন, নারী কি সবসময়ই একটি প্রশ্নের ব্যাপার ছিল না, এখনো কি সেটি একটি প্রধান সামাজিক প্রশ্ন নয়? অবশ্য যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন নিকট-ভবিষ্যতে নারী-পুরুষ সামাজিকভাবে সমান অবস্থানে আসবে কি না, তাহলে বলব 'না'। নারী-পুরুষের সমতা আসতে আরো বহু বছর, শতাব্দী চলে যাবে। এরকম প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতেই তা আসবে। ক্রমশ নারীর শারীরিক শক্তি বাড়বে, সামাজিক ক্ষমতা এবং সম্পদ বাড়বে। কয়েকজনের বিচ্ছিন্ন কর্মকান্ডে কিছু হবে না।'

'মেয়েরা কি রাজনৈতিকভাবেও ক্ষমতাবান হবে বলে মনে করেন?'

'আমি তা বলছি না। আমি বলছি আপনি চান বা না চান মেয়েদের নাগরিক ক্ষমতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাবে। সামাজিকভাবে তারা পুরুষের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে। আমেরিকায় তো ইতিমধ্যেই মেয়েরা অনেকটুকু এগিয়ে এসেছে। অর্থনৈতিকভাবে তাদের যেভাবে বঞ্চিত রাখা হয়েছে আমি বিশ্বাস করি এ অবস্থা বদলে যাবে। তবে মেয়েরা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা পাবে কি না, তারা ভোটের অধিকার পাবে কি না সেটা অন্য প্রশ্ন।

'মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আপনি বিশ্বাস করেন?'

'নিশ্চয়ই, তবে ধীরে ধীরে। মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা যে বেড়েছে তা তো চারিদিকে তাকালেই আপনি দেখতে পাবেন। সামাজিকভাবে মেয়েদের এখন আর আগের মতো তুচ্ছ করা দেখা হয় না। মেয়েরা এখন শুধু সন্তান উৎপাদন করে না, তারা পুরুষের অন্যান্য কাজেও সহযোগী বন্ধু।'

'ড: ইবসেন, 'নারী' প্রসঙ্গটির ওপর আপনার বেশ ভালো দখল আছে—আমরা ধরে নিতে পারি', আমি বলি।'

'না, একটা প্রসঙ্গকে আমি বর্ণনা করেছি বলেই যে সে ব্যাপারে আমি একটা স্পষ্ট ধারণা রাখি তা ঠিক নয়,' ইবসেন বললেন।

'আগামীতে মেয়েদের অর্থনৈতিক উন্নতি কতটুকু হবে বলে আপনি মনে করেন?'

'সেটা নির্ভর করবে ইউরোপের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতির ওপর। তবে ইউরোপের অর্থনীতি আদৌ উন্নতির দিকে যাচ্ছে কি না, আমার সন্দেহ হয়। প্রাচ্যের সঙ্গে অচিরেই ইউরোপকে একটা কঠিন প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। মেয়েরা আগামীতে নিঃসন্দেহে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে কাজ করবে। অবশ্য শারীরিক শ্রমনির্ভর কাজে মেয়েরা সবসময় পিছিয়ে থাকবে। তাদের ঋতুস্রাবের সময়, গর্ভকালীন সময় তাদের কাজের ব্যাঘাত ঘটবে। তবে মজুরির ক্ষেত্রে সমতা আসবে। এখন যেমন অনেক কারখানায় খনিতে সমান কাজ করেও মেয়েরা পুরুষের অর্ধেক মজুরি পাচ্ছে এ অবস্থা থাকবে না।'

'স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় মেয়েদের অবস্থা কেমন'

'তুলনামূলকভাবে ভালো। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অনেক মেয়েকে লক্ষ্য করেছেন। এরা অধিকাংশই গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছে এবং শহরে একা বাড়ি ভাড়া করে

থাকছে। এই মেয়েদের আচরণে আত্মপ্রত্যয়ী ভাবও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। অবশ্য একথাও বলতে হয় ক্রিশ্চিয়ানার মতো আগাপাছতলা একটা নীতিহীন শহরে নারীর ক্ষমতা তো এমনিতেই বেড়ে যায়। যেমন এখন প্যারিসে একজন মন্ত্রীর চেয়ে একজন বেশ্যার ক্ষমতা বেশি। নারী আদর্শবাদীদের জন্য বিষয়টি অপ্রিয় হলেও এটি বাস্তব অবস্থা।

'কিন্তু ক্রিশ্চিয়ানা কি এতটাই নীতিহীন? রাস্তাঘাট তো বেশ সভ্যই দেখতে পাচ্ছি।'

'রাস্তাঘাটগুলো এমন সভ্য বলেই তো ঘরের ভেতরগুলো এতটা অসভ্য। যৌনতার কল্পনাতীত বিচিত্র দিক বিকশিত হয়েছে এখানে। লোকেরা বিয়ে করে বিচ্ছেদ ঘটায় আবার বিয়ে করে। এ অবস্থা ফরাসি ভেন্দেলিস্তে নাটকগুলোকেও হার মানাবে।'

সিফিলিস, মাতলামো

'আমার মনে হয় বেশ্যাদের ওপর থেকে সরকারি নজরদারি তুলে দেওয়ার পর থেকে এখানে যৌনরোগের প্রকোপও বেড়ে গেছে'—আমি বলি।

'হ্যাঁ, স্টকহোমের পর এখানেই সম্ভবত ইউরোপের সর্বাধিক সিফিলিস রোগী,' বললেন ইবসেন।

'আচ্ছা, ঘোস্ট নাটকে'...আমি বলতে শুরু করলে তিনি থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওই সব পুরানো কথা বাদ দিন।' (সেখানকার থিয়েটার কর্তৃপক্ষ নাটকটি মঞ্চস্থ হতে অনুমতি দেয়নি—অনুবাদক) ওরা যা ভালো মনে করেছে তা-ই করেছে।'

'মনে করা হয় যে, এই সিফিলিস মহামারীর আশঙ্কাতে, সরকারি আইনের প্রতিবাদেই আপনি নাটকটি লিখেছেন।'

ইবসেন কোনো উত্তর দেন না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, 'এই ভয়াবহ মহামারীর দমন করতে কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?'

'আমি'? আমি কোনো পদক্ষেপ প্রস্তাব করবার কে? এই ব্যাপারে আমার কিছু করণীয় নেই। বলা হয়েছে, সিফিলিস-আক্রান্ত মানুষের বিয়ে করা নিষেধ। কিন্তু বাহ্যিক উপসর্গ চলে যাওয়ার পর আপনি কীভাবে বুঝবেন, কে সিফিলিস রোগী কে নয়? এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে পারে ডাক্তাররা। তারা যদি কোনো নিরাময় খুঁজে পায় তবে ভালো হয়। এখানকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরীক্ষা চালানোর জন্য নিজের শরীরে সিফিলিসের জীবাণু গ্রহণ করেছিল কিন্তু পরে সে মারা যায়। পাস্তুর কিছু একটা আবিষ্কারের চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু শুনেছি এ রোগের ওপর গবেষণা চালাতে তিনিও অসম্মতি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই রোগে আক্রান্তদের ব্যাপারে তার কোনো সহানুভূতি নেই।

'কিন্তু এই রোগের নিষ্পাপ শিকার, যেমন আপনার ঘোস্ট নাটকে সিফিলিস-আক্রান্ত বাবা-মার সন্তানটি, তাদের প্রতি নিশ্চয়ই সহানুভূতি জাগতে পারে?'

'হ্যাঁ যারা ফিরে ফিরে আসে, ঘোস্ট নাটক এরকম একটা ধারণা দেয়।'

'নাটকটি বংশগতি-সংক্রান্ত আপনার মতবাদও প্রকাশ করে।'

‘আমার মতবাদ? না, আমার কোনো মতবাদ নেই। আমি আগেও বলেছি আমার নাটক কোনো মতবাদ প্রচার করে না। আমি চারপাশে যা দেখি তা-ই প্রকাশ করি। জীবনে বংশগতির ব্যাপারটির অতিশয় গুরুত্ব আমি লক্ষ্য করেছি। তারই দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছি শুধু।’

‘বংশের দৈহিক প্রভাবের পাশাপাশি মানসিক এবং নৈতিক প্রভাবও আছে বলে কি মনে করেন?’

‘নিশ্চয়ই। দুটো আসলে একই ব্যাপার।’

‘কিন্তু বংশ ছাড়াও মানুষের ব্যক্তিত্ব কি শিক্ষা এবং পরিবেশ দিয়েও প্রভাবিত নয়?’

ইবসেন খানিকটা অসহিষ্ণু হয়ে বলেন, ‘সেকথা তো আমিও জানি, আপনিও জানেন। শিক্ষা ও পরিবেশ একটি শিশুর নৈতিক চরিত্র গঠনে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। তবে দেহ গঠনে বিশেষ নয়। বংশগত সিফিলিস-আক্রান্ত রোগীকে তো শিক্ষা দিয়ে রোগমুক্ত করা যাবে না। তাকে হয়তো পাগল বা মাতাল হওয়া থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।’

‘মদ্যপান কি নরওয়েতে একটি বড় সমস্যা?’

‘হ্যাঁ, ব্যাপক সমস্যা। মদ্যপান বন্ধের জন্য নানা নিয়মকানুন করা হচ্ছে। তবে-এসব বন্ধের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। রাস্তাঘাটে এখন তো আগের চেয়ে অনেক বেশি মাতাল দেখি।’

‘এই মাতলামো কি দারিদ্র্যের কারণে?’

‘এটা একটা চক্র। নিজের দুর্দশা ভুলবার জন্য লোকে মদ খায় আবার মদ খেয়ে সে আরো দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তবে সার্বিক বিচারে মদ খাওয়াটা কারণ, ফলাফল নয়।’

অনুবাদ : শাহাদুজ্জামান

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শহিদুল ইসলাম বিজু